Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 290
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 281 - 290
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 – 0848

উত্তরবঙ্গের ভাষা-সংস্কৃতি : প্রসঙ্গ গোপীচন্দ্রের গান

বাবুচরণ রাভা
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়, মল্লারপুর, বীরভূম
Email ID: rabhababu05@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Gopichandra, George Grierson, Manikchandra, Devanagari, Asiatic society, Ashutosh Bhattacharya, North Bengal, rangpur, culture, linguistic.

Abstract
Gopichandra's songs form an important narrative in Bengali oral literary canon. The song of Gopichandra has been seen as one of the progressive literary genres from the ancient to modern age in the history of Bengali oral literature. Sir George Grierson was the first person to collect the songs of Gopichandra from local singers in 1878 and published them as 'song of king Manik Chandra' in Devanagari Script in the magazine of the Asiatic society. Latter, Sri Bisheshwar Bhattacharya adopted the Griearsonian approach around 1907-1908 and documented all the songs of Gopichandra by collecting it from the Yogi beggars. It was only in 1922 when the first edition of Gopichandra's songs were published from Kolkata University. Acceptance of religious mendicancy by Gopichandra is the major subject matter of this narrative.

There is no doubt that the culture of North Bengal has corroborated Bengali language and literature. the culture of North Bengal has taken a of special place in the literary world of Bengal. Gopichandr's songs are one among the many pieces of narrative poems available in Bengali literature. This songs reflect the society and culture of North Bengal. a significant subject of gopichandras songs is its language which is not considered to be of ancient times by many critics. it is thought that this language is perhaps of Modern Times. Some have claim this language to be of the 17th century. there has thus been a wide range of debate among critics regarding the language of these song.

according to Dr. Ashutosh Bhattacharya Gopichandras songs must have been written by them from collecting circulation among the illiterate Muslim peasants of rangpur district of the nineteenth century due to which elements of this time period has also influenced the

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 290
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

language of these songs. a general debate however exists regarding the language of Gopichandras song. beyond all this uncertainties and debates regarding the linguistic complexity, subtle analysis of these songs shows that the language shares close affenty with the Bengali dialect of North Bengal in undivided Bengal. Thus, Gopichandras songs can give an idea of the language and culture of north Bengal. According to Dr. sri Ashutosh Bhattacharya the social information presented in it is almost all the information of the regional muslim society of North Bengal in the 19th century. this paper is going to be an elaboration on the above maintaoned issues regarding the language of Gopichandras song and the reflection of North Bengal's linguistic culture in it.

Discussion

উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিচয় সম্পর্কে প্রথমেই বলতে হয় ভারতের মানচিত্রে 'উত্তরবঙ্গ' বলে কোন ভূখণ্ডের উল্লেখ্য নেই। 'উত্তরবঙ্গ' বললে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশ বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাগুলিকে বোঝায়। কিন্তু বিভাগ পূর্ববর্তী বাংলায় উত্তরবঙ্গের ভৌগলিক সীমানা ভিন্ন ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ উত্তরবঙ্গ। বিভাগ পূর্ব বাংলায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ- সমতল বাংলার সঙ্গে ছিল দুস্তর ফারাক। ভাবনায়, ভাববিলাসিতায় সমতল অঞ্চলের জনজীবনের তুলনায় উত্তরবাংলার জনজীবনের বৈচিত্র্য অনেক-বহুবিচিত্র। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে সমতল অঞ্চলের মানুষ যেমন এসে বসতি করে তুলেছিল তেমনি এসেছিল অ-বাংলাভাষী নানা সম্প্রদায়ের মানুষ। সাংস্কৃতিক সম্মেলনে গড়ে ওঠে এক ভিন্ন মানসিকতা। অখণ্ড বাংলায় সর্বত্র এক বৈচিত্র্যময় জীবনধারা বিস্তারিত হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরা উত্তরবঙ্গ। অখণ্ড বাংলায় বিপুল সম্পদ নিয়ে এই বৃহৎ অঞ্চলটি অরণ্য ঐশ্বর্যে ভরপুর। কত মানুষ পাশাপাশি বংশপরম্পরায় বসবাস করছে। উত্তরবাংলার পরিচয় বর্ণনাকালে বাংলাদেশ ও সেই বর্ণনায় গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের অতুলনীয় অরণ্যকে নির্বাচিত করে উত্তরবঙ্গের ঐশ্বর্য দিগন্ত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। ইংরেজদের চা বাগিচায় কাজ করতে এসেছিল বিহার, উত্তর প্রদেশ আর দক্ষিণ ভারত থেকে অগণিত নানা উপজাতির মানুষ।

এদিকে মালদহ, দিনাজপুর উত্তর ও দক্ষিণ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আর ওদিকে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা এই নিয়েছিল অবিভক্ত বাংলার উত্তরবঙ্গ। এখনোও আছে উত্তরবঙ্গই তবে বিভক্ত। দুটো দেশ। ভূখণ্ড একই, ভাষা একই, নদনদী, গাছপালা, আনাজপাতি, খাওয়া-দাওয়া সবই আছে যথারীতি, কেবল দুপারের মাঝখানে শক্ত কাটাতারের বেড়া। স্বাভাবিকভাবে চলাচল বন্ধ কিন্তু আমাদের উৎসব মেলা, পার্বণে দুপারের মানুষ একত্র হয়ে যায় বড় কাছাকাছি এসে পড়ে। আইনকানুন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ধর্মও কোন বাঁধা নয়, সেখানে একটি পরিচয় বড়ো, আমরা বাঙালি। উত্তরবঙ্গে বাঙালি আছে, আছে অন্যান্য ভারতীয় অধিবাসী। আছে বিভিন্ন জনজাতি। তার মধ্যে কয়েকটি হল- মুন্ডা, খেন, ভুটিয়া, তামাং, মগর, গুরুং, খাসি, খেড়িয়া, ওঁরাও, মাহালি, মালপাহাড়িয়া, লিম্বু, লেপচা, মেচ, কোচ, রাজবংশী, রাভা, গারো, রাই, শেরপা, কুরমালি, বিরহড়, চিকবরাইক, চাই, সাঁওতাল, ধিমাল, আরো অনেক জাতি জনজাতি অধ্যুষিত এই উত্তরবাংলা। অনুন্নত দারিদ্রপীড়িত কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষার আলোহীন এক বিশাল জনগোষ্ঠীর বসবাস সুদীর্ঘকাল ধরে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এদের অবদান সব থেকে উল্লেখযোগ্য।

উত্তরবঙ্গের ভাষা, সমাজ-সংস্কৃতির আলোচনা করতে হলে প্রথমই উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। ১৯৭১ সালে ভারতীয় আদমশুমারীর বিবরণ অনুসারে উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৭৪ লক্ষ ১৮ হাজার

৬৬৩ জন। এর মধ্যে তপশিলি জাতির সংখ্যা ২০ লক্ষ ৭ হাজার ৭৭৩ এবং তপশিলি জনজাতির সংখ্যা ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮২৪।[১] এই তপশিলি জাতির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে রাজবংশী (পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার) ও পলিয়া (জলপাইগুড়ি, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর) এবং সংখ্যালঘু হচ্ছে বেলদার (মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, ভুঁইমালি (মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর) দোসাদ (মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি), গোঁড়ি (মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, মাল (জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার), মুশাহার (মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর), নুনিয়া (মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর), তিয়র (মালদা, দার্জিলিং) ইত্যাদি। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এইসব তপশিলি জাতির উদ্ভবগত পরিচয় যাই হোক না কেন এরা এখন সাংস্কৃতিক পরিচয় বাঙালি ও ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দু বা হিন্দু প্রবণ এবং এদের মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা বাংলা। এই সঙ্গে পার্বত্য জেলা দার্জিলিং এর কয়েকটি তপশিলি জাতির কথা উল্লেখ করতে হয় যেমন দামাই, কামি, সার্কি ইত্যাদি এরা ধর্ম হিন্দু নেপাল থেকে আগত তাই এদের মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা নেপালী।

উত্তরবঙ্গের তপশিলি উপজাতি বা জনজাতির মধ্যে দুটি ধারা প্রধান **১.** মোঙ্গোলীয়, ২. আদি অস্ট্রাল। এরা মুখ্যত উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলেই উপনিবিষ্ট। যেমন-

১. ভুটিয়া : ধর্মবিশ্বাসে মুখ্যত বৌদ্ধ, সামান্য কিছু খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত, ভাষা ভুটিয়া বা তিব্বতি ভাষার পূর্বাঞ্চলিও উপভাষা।
২. লেপচা : ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে এরা তিনভাগে বিভক্ত ক. জড়োপাসক খ. বৌদ্ধ গ. খ্রিস্টান। এদের ভাষা ভোটচিনীয় ভাষাবর্গের অন্তর্গত লেপচা বা ‘রং’, তবে শহরাঞ্চলের লেপচাভাষীদের ওপর ওপর নেপালী ভাষার প্রভাব ক্রমবর্ধমান। অনেক ক্ষেত্রে এদের ঘরের ভাষা লেপচা হলেও বাইরের ভাষা নেপালী।

রাভা : উত্তরবঙ্গে মূলত এদের মধ্যে দুটি শ্রেণী দেখা যায় - (ক) গ্রামবাসী ও (খ) অরণ্যবাসি রাভা। অরন্যবাসীরা মূলত জড়োপাসক এবং বর্তমানে অধিকাংশই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। গ্রামবাসী রাভারা জড়োপাসক হলেও প্রতিবেশী রাজবংশীদের প্রভাবে এদের মধ্যে হিন্দুত্ব প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অরণ্যবাসীদের ভাষা রাভা বা ‘কোচাক্রৌ’ গ্রামবাসী রাভাদের মধ্যে বয়স্করা ‘কোচাক্রৌ’ এর ব্যবহার জানলেও তরুণদের মধ্যে ‘কোচাক্রৌ’ ভাষার ব্যবহার বিলীয়মান। তার জায়গায় বাংলার স্থানীয় উপভাষার ব্যবহার ক্রমবর্ধমান।

মেচ : জনসংখ্যার নিরিখে একটি বড় অংশ অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার পর্বত সন্নিহিত এলাকায় অবস্থিত। অবশিষ্টরা কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলায় উপনিবিষ্ট। এদের আদিম ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর প্রভাব ক্রমবর্ধমান। অন্তর্গত ভোটচিনিও ভাষাবর্গের অন্তর্গত মেচ বা বোড়ো ভাষাই এদের প্রথম ভাষা দ্বিতীয় ভাষা বাংলার আঞ্চলিক উপভাষা।

গারো : গারোদের প্রধান বাসস্থান অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা এবং কোচবিহার জেলা। গারোদের প্রধান অংশ হিন্দু, কিছু খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত। গারোদের ঘরের ভাষা ভোটবর্মী বর্গের গারো ভাষা, বাইরের ভাষা বাংলা।

টোটো : ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী টোটো সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬০০। একমাত্র অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট থানার অন্তর্গত টোটোপাড়া গ্রামে এদের বাস। চেহারা ও বেশভূষায় ভুটিয়া উপজাতির সঙ্গে এদের মিল থাকলেও ধর্ম ও ভাষার ব্যাপারে এদের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। এদের ভাষা টোটো ভোট চিনিও বর্গের অন্তর্গত। প্রায় সবাই নেপালী ভাষা বোঝেন এবং বলতে পারেন। কিছু কিছু টোটো বর্তমানে বাংলায় কথা বলতে পারেন।

এছাড়াও আদি অস্ট্রাল উপজাতির একটি বড় অংশ উত্তরবঙ্গে রয়েছে। এদের মধ্যে আছেন মুণ্ডা, নাগেশিয়া, সাঁওতাল, মাহালি, কোরা প্রভৃতি। আদি-অস্ত্রাল ছাড়াও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দুটি উপজাতি উত্তরবঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভাবে বিদ্যমান। যেমন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 290
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ওঁরাও : এরা মূলত উত্তরবঙ্গের অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা ও দার্জিলিং জেলার চা বাগান এলাকায় উপনিবিষ্ট। এদের ধর্মবিশ্বাসে জড়োপাসনা ও হিন্দু দেবদেবীর পূজা মিশ্রভাবে বর্তমান। এদের আদি মাতৃভাষা 'কুরুখ'। বাঙালীদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাংলা ও সাদরি এবং অন্যান্য উপজাতির লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় 'সাদরি' ভাষা ব্যবহার করেন।

মালপাহাড়িয়া : উত্তরবঙ্গে এরা প্রধানত জলপাইগুড়ি, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলায় উপনিবিষ্ট। সমতলে এরা চাষবাস করেন, চা বাগানে এরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এদের ধর্মবিশ্বাসে ঔপজাতিক জড়োপাসনা ও হিন্দু দেবদেবীর পূজা প্রবণতা মিশ্রিত হয়েছে। মাতৃভাষা 'মালতো' দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

তপশিলি জাতি ও উপজাতি ছাড়া উত্তরবঙ্গে জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশে আছে বাঙালি ও অবাঙালি বর্ণ হিন্দু ও মুসলমান। বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের একটা অংশ উত্তরবঙ্গে চা শিল্পের বিস্তার সূত্রে গত শতকের শেষ থেকে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলা এবং মধ্যবঙ্গের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি এলাকা থেকে উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্ট হতে থাকেন।

কোচবিহার তথা অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের প্রাচীন মৌখিক সাহিত্যের বিশেষ নিদর্শন 'গোপীচন্দ্রের গান'। কোথাও কোথাও একে ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের গানও বলা হয়। উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করেছে সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যে উত্তরবঙ্গের ভাষা-সংস্কৃতি এক বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। সেরকমই একটি আখ্যানকাব্য গোপীচন্দ্রের গান। উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র আয়তনে সীমাবদ্ধ নয়। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক ও জনজীবনের বৈচিত্র অসাধারণ। পূর্বেই বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গ মানে মালদা হতে কোচবিহার নয়, বাংলাদেশের উত্তর অংশের একটা বৃহৎ অংশ উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের টেক্সট হল গোপীচন্দ্রের গান। এই গোপীচন্দ্রের গানে কিভাবে উত্তরবঙ্গের ভাষা এবং সংস্কৃতির পরিচয় উঠে এসেছে তা এখানে আলোচনা করে দেখা হল।

১৮৭৮ খৃষ্ট অবধে স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন সাহেব রংপুর থেকে স্থানীয় গায়কের নিকট সর্বপ্রথম গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন এবং 'মানিক চন্দ্র রাজার গান' নামে দেব নাগরী হরফে ওই বছরের এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এরপরে রংপুরের নীলফামারী মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ১৯০৭ থেকে ১৯০৮ সালের দিকে গ্রিয়ার্সনের পন্থা অবলম্বন করে তিনজন যোগী ভিখারীর মুখ থেকে গোপীচন্দ্রের সমস্ত গানটি লিখে নিলেন। এর অনেক পরে ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গোপীচন্দ্রের গানের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। এতে গ্রিয়ার্সন এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগৃহীত গান অবলম্বনে পালা গান মুদ্রিত হয়। ১৯২৪ সালে এই পালার দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়। এতে পুঁথির পাঠ গৃহীত হয়েছিল। একটি হলো ভবানী দাসের গোপীচন্দ্রের পাঁচালী এবং আরেকটি সুকুর মহম্মদ রচিত গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।[২] এরপর ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে আশুতোষ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে গোপীচন্দ্রের গান প্রকাশিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। গোপীচন্দ্রের গানের পাঁচটি খন্ড। এই গোপীচন্দ্রের গানে উত্তরবঙ্গের ভাষা এবং সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

গোপীচন্দ্রের গানের শুরুতেই আমরা পরামানিকের প্রসঙ্গ পাই। প্রজারা পরামানিকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই পরামানিক আসলে কে? এই পরামানিক হলো আসলে পোইচবারিক > পঞ্চবারিক > পরামানিক। যার অর্থ বিচারক বা অভিভাবক। এই 'পঞ্চবারিক' অর্থাৎ 'পঞ্চ' ও 'বারিক' প্রথা উত্তরবঙ্গের বিশেষ প্রথাগত আইন (Customary law) এর অন্তর্গত। যার প্রসঙ্গ গোপীচন্দ্রের গানে রয়েছে -

> 'ছোট রাইত বলে দাদা বড় রাইত ভাই।
> চলো সক্কল মেলি যুক্তি করি পরামানিকের বাড়ি যাই।
> চল চল যাই দাদা পরামানিকের নাগিয়া।
> কি বুদ্ধি দ্যায় পরামানিক আমাকে নাগিয়া।।''[৩]

রাজার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরিদ্র অসহায় প্রজারা তাদের মোড়লকে নিয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হওয়ার প্রসঙ্গও এখানে রয়েছে।

> ''ওঠে থাকি রাইয়ত হরষিত মন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 290
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মহাদেবের কাছে যাইয়া দিল দরশন।।
জোড় হস্ত করিয়া কয় বিবরণ।।
ধন-কাঙ্গালি হৈল রাজা, মহাদেব, রাজ্যের ভিতর।
* * *
মহাদেব বলে, শুন, রাইয়তগণ,
পারনি গঙ্গার লাগি চলো হাঁটিয়া।"[৪]

এই মহাদেব এখানে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা পৌরাণিক কোনো দেবতা নন। মহাদেব হল আসলে উত্তরবঙ্গের কৃষক সমাজের লৌকিক দেবতা। দিনাজপুর জেলায় ইনি 'মহারাজা' নামে কৃষক সমাজ কর্তৃক পূজিত হয়ে থাকেন। যার পরিচয় এখানে উঠে এসেছে।[৫]

'বুঝান খণ্ডে' দেখি রাজা গোপীচন্দ্রের নির্দেশে তৈল পরীক্ষার পর মাতা ময়নামতির সত্যজ্ঞানীর পরীক্ষা হিসেবে নৌকা পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। খরশান বৈতরণী নদীতে জননী নৌকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই রাজা মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবেন বলে জানিয়েছেন। মাঝি নেই, দাঁড়ি নেই, কান্ডারি নেই, মাছির মুণ্ড রাখার মত জায়গা নেই এমন তুষের নৌকা চড়ে ময়নামতিকে বৈতরণী পার হতে হবে। গুরু গোরক্ষনাথ, হাড়িসিদ্ধা, ধীরনাথ কুমার, মিনবা কেউই এই নৌকোপুজো করে দিতে সম্মত হন না। শেষে ময়নার ডাকে আসেন শিব। তুষের নৌকা দেখে ভয় পেয়ে শিব প্রথমে পুজো করে দিতে অসম্মত হন। ক্রুদ্ধ হয়ে ময়না দেবতাদের মধ্যে লাফ দিয়ে শিবকে ধরতে গেলে দেবতারা ভয়ে পলায়ন করেন। কচু বাড়ি দিয়ে বুড়ো শিব পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা মাত্র কোলা ব্যাঙের মতো লাথি মেরে শিবকে ময়না খপ্ করে ধরে ফেলেন। ময়নার কোথায় বুড়ো শিব শেষ পর্যন্ত বৈতরণীর ঘাটে গিয়ে নৌকো পুজো করে দিতে থাকেন।

"যখন বুড়া শিব তুষের নৌকা দেখিল।
ভয় খাইয়া বুড়া শিব না জবাব দিল।।
ক্রুদ্ধমান হৈয়া ময়না ক্রোধে জ্বলিয়া গেল।।
দেবগণের মাঝত ময়না মাল্লে আলকচিত।
ভয় খাইয়া দেবগন পলায় ভিতাভিত।।
কচুবাড়ি দিয়া বুড়া শিব যায় পলাইয়া।
কোলা ব্যাঙ্গের মতন ময়না নিগায় ন্যাদিয়া।।
খপ করি বৃদ্ধমাতা শিবকে ধরিল।
শিবের তরে কথা ময়না বলিতে লাগিল।।
* * *
কাতর হৈয়া বুড়া শিব বৈতরণীর ঘাটে গেল।
আনন্দিত হৈয়া নৌকা পূজিতে লাগিল।।"[৬]

শিবের এই যে প্রসঙ্গ এখানে আমরা পাই এটি আসলে শৈবধারা ও সংস্কৃতির পরিচয়কে বহন করে। যার লৌকিক আচার গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে রয়েছে। এখানে যে শিবের কথা বলা হয়েছে সেই শিব আসলে লোকদেবতা। যে লোকদেবতাকে আশুতোষ ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গের 'কোচ' জনজাতি সম্প্রদায়ের কৃষি দেবতা বলেও উল্লেখ করেছেন।

'জন্ম খণ্ডে' আমরা পাই রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু রহস্য এবং সেই সঙ্গে মাণিকচন্দ্র রাজার মৃত্যুর পর তার পুত্র গোপীচন্দ্রের জন্মের কথা। রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু প্রসঙ্গে এই জন্ম খণ্ডে যমের মিথের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। যেখানে আমরা দেখি গোদা যম বারবার রাজা মাণিকচন্দ্রের জীবন নেওয়ার জন্য রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং রানী ময়নামতি ছল-চাতুরির মাধ্যমে যেভাবে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে বা এক প্রকার যুদ্ধ করে তার স্বামী রাজা মাণিকচন্দ্রের জীবনকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন সে বর্ণনা আমরা পাই-

"যম বলে, শুনেক, ময়না, হামি বলি তোরে।

তোর সোয়ামীর তলপ চিঠি আন্ ছি বান্ধিয়া।।
আইজ তোর সোয়ামীর জিউ নিগাব বান্ধিয়া।।
যখন গোদা যম একথা বলিল।
করুণা করিয়া ময়না কান্দিতে লাগিল।।”[৭]

এখানে এই যে যমের মিথ এর কথা বলা হয়েছে তা উত্তরবঙ্গে পরিলক্ষিত হয় যেমন দার্জিলিং, রংপুর, জলপাইগুড়ির বিস্তৃত অঞ্চলে এই মিথের প্রচলন রয়েছে। গানের মধ্যে আমরা দেখি রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ময়না কীর্তনীয়াকে ডাকার এবং স্বামীকে শস্ করার প্রসঙ্গে গৃহস্থার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। যেমন -

“কি কর, হেমাই পাত্র, কার পানে চাও।
যত মন কীর্তনিয়াক আইস ধরিয়া।
সোয়ামীক শস্ করিব গঙ্গাক নিগিয়া।।
কি কর গিয়াস্তা সকল নিশ্চিন্তে বসিয়া।
দক্ষিণ দুয়ারি বাঙ্গলা ফেলাও ভাঙ্গিয়া।
* * *
তিল সরিষা তেল ঘি নেও কোটোরায় ভরিয়া।।”[৮]

এই যে কীর্তনীয়া ডাকা, শস্ করা বা মৃতদেহ সৎকার প্রসঙ্গে ‘গৃহস্থা’ বা ‘গিয়াস্তা’ ডাকার সংস্কৃতি তা উত্তরবঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জাতি জনজাতি সমাজ ব্যবস্থার এক বিশেষ রীতি হল গৃহস্থা সিস্টেম। ‘গৃহস্থা’ ছাড়া কোন শুভ কাজ আরম্ভ সম্ভবপর নয়। বিবাহ করতে যাওয়ার মুহূর্তে কিংবা মৃতদেহ সৎকারের সময় গৃহস্থার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জাতি জনজাতি যেমন রাজবংশী, বোড়ো, কোচ, হাজং, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গৃহাস্থা বা গিয়াস্তা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে যার পরিচয় আমরা গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে পাই। রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর মৃতদেহ সৎকারের সময় ময়নার কথায় গৃহস্থার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। অর্থাৎ রাজার মৃত্যুর পর তার যে লৌকিক আচার তা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের। শুধু তাই নয় মাণিকচন্দ্রের শব দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিভিন্ন রীতিনীতি বা শ্রাদ্ধশান্তি করা হয় যেমন গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে স্নান করানো নতুন বস্ত্র পরিয়ে কীর্তনের মধ্যে দিয়ে আমের পল্লব হাতে নিয়ে স্বামীর শবদেহের সঙ্গে ময়নামতির দাঁড়িয়ে থাকা, জ্ঞাতিদের তিল, সরিষা, তেল, ঘি দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি আচার সম্পূর্ণ উত্তরবঙ্গের লোকাচারের অন্তর্গত। উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিতে জন্ম মৃত্যু বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাহার পরিচয় আমরা এই গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে পাই।

রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর গোপীচন্দ্রের জন্ম হলো ছেলেকে দেখে ময়না ভীষণ খুশি হলেন। গঙ্গায় ডুব দিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নেন ময়না। এরপর ময়না হেমাই পাত্রকে সোনা দাইয়ের বাড়ি গিয়ে সোনা দাই কে নাড়িচ্ছেদ করার জন্য শীঘ্রই আসতে বলেন-

“মাণিকচন্দ্র মরি গেল গোপীচন্দ্র হৈল।
'হেমাই পাত্র' বলি ময়না ডাকিবার লাগিল।।
'কি কর' হেমাই পাত্র, কার পানে চাও।
শীঘ্রগতি সোনা দাইক আনিয়া জোগাও।।
যখন হেমাই পাত্র ছাইলাক দেখিল।
দেখিয়া হেমাই খুসি ভাল হৈল।।
সোনা দাইর বাড়ি লাগি গমন করিল।
সোনা দাইর বাড়ি যাইয়া দরশন দিল।।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 290
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

* * *

মাণিকচন্দ্র মরি গেল গোপীচন্দ্র হৈল।
নাড়িচ্ছেদ করিতে সোনা শীঘ্রগতি চলো।।"[৯]

এই দাই উত্তরবঙ্গসহ গোটা বাংলাদেশেই আছে। সাধারণত হাজরা এবং ঋষি পদবিধারীরা এই কাজ করে থাকেন। সন্তান প্রসবকালে 'দাই' এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার ফলে এই রীতির প্রচলন সেভাবে দেখা না গেলেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রচলন এখনও রয়েছে। গোপীচন্দ্রের জন্মের তিনদিন পর গোপীচন্দ্রের তিন কামান, চতুর্দিনে চতুর্থা, পাঁচজন ব্রাহ্মণ এনে বেদ বিধি তথা পূজা পাঠ করানো ও দশ দিনে দশা, ৩০ দিনে ত্রিশা, সংকীর্তন যজ্ঞ, জ্ঞাতিভোজন, ছয় মাস পরে নামকরণের অনুষ্ঠান ইত্যাদি যে লৌকিক আচার তা সম্পূর্ণ ভাবে উত্তরবঙ্গের লৌকিক আচারের অন্তর্গত।

"তিন দিন অন্তরে রাজাক তিন কামান করিল।
চাইর দিন অন্তরে রাজার চতুর্থা করাইল।
ব্রাহ্মণ পঞ্চজন আনিয়া তার বেদ বিধি করাইল।
আজি আজি কালি কালি দশ দিন হৈল।।
দশ দিন অন্তর রাজার দশা করিল।
আজি কালি করিয়া ত্রিশ দিন পুরিল।।"[১০]

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে "ইহার মধ্যে যে সামাজিক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তাহা প্রায় সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক মুসলমান সমাজের তথা ব্যতীত আর কিছু নয়, কড়ি দ্বারা ইহাতে রাজপুর পরিষদ পরিবার প্রথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে সর্বতো দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেছেন ইহা হিন্দু রাজত্বের সময়কার ঘটনা কিন্তু করির ব্যবহার বাংলার সুদূর পল্লী গ্রামে ৫০ বছর পূর্বেও প্রচলিত ছিল ময়নামতি যে হাটবাজারে যাইতেন। তাও হিন্দু রাজত্বের সময়কার কথা নয়। যে উত্তরবঙ্গে গোপীচাঁদের গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল সেখানকার কোচ এবং রাজবংশী স্ত্রীলোকগণ এখনো সর্বদাই নিজেরাই হাট বাজার করিয়া থাকেন। পল্লী গায়েন তাহার সমাজের সমসাময়িক একটি চিত্রই এখানে বর্ণনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর গায়েনের হিন্দু রাজত্বের একটি ঐতিহাসিক সমাজ চিত্র পরিবেশন এর কোন দায়িত্ব পালন করিবার কথা নয় ইহা দ্বারা যে অবাক স্ত্রী স্বাধীনতা সূচিত হয়ে হইতেছে তাহা ও হিন্দুরা যুদ্ধের সময়কালীন কোন চিত্রগুলি মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ তাহাও উত্তরবঙ্গের মাতৃতান্ত্রিক ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জাতির বংশধর কোচ, বড়ো ও রাজবংশী জাতির একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য মাত্র।"[১১]

গোপীচন্দ্রের গানে 'দরগুয়া' করার কথা আছে। এই দরগুয়া হল বিবাহের একধরনের সংস্কার বা সংস্কৃতি যেখানে বিবাহের কথাবার্তা পাকা করে সেই উপলক্ষে গুয়া-পান খাওয়ানো হয়। কোথাও কোথাও ছেলেপক্ষ ও মেয়েপক্ষকে দিয়ে পাঁচখানা সুপারি মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় এবং সেই সুপারি খাওয়ানো হয়। যেটি এখনো উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির অন্তর্গত। যার প্রসঙ্গ এখানে রয়েছে-

"এক মঙ্গলবার শুভাশুভ বুঝিল।
ফের মঙ্গলবার দিনা দরগুয়া করল।।"[১২]

ভাষা প্রসঙ্গ : গোপীচন্দ্রের গান নিঃসন্দেহে নাথ ধর্মের একটি অংশ ও মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটের আবহে লিখিত একটি মৌখিক সাহিত্য। গোপীচন্দ্রের গান গায়েনদের মুখ থেকে শুনে লেখা যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অনেক ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত্রুটি থেকে গেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন –
"ইহা কোন পুঁথি দেখিয়া সম্পাদিত নয় গায়েনের মুখ হইতে শুনিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল তথাপি তাহাতে যথেচ্ছ ভুল বানান ব্যবহার করা হইয়াছিল এমনকি তৎসম শব্দের বানানগুলি পর্যন্ত ভুল করিয়া মুদ্রিত হয়েছিল কিন্তু এই ভুলের যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 290
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটি কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালী ছিল, তাহা নহে যাহা মুখ হইতে শুনিয়া লেখা। তাহার বানান ভুল করিয়া মুদ্রিত করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের বানানের ক্ষেত্রে সম্পাদক আশুতোষ ভট্টাচার্য সর্বদাই যথাসম্ভব বানানের সংস্কার সাধন করেছেন। আদি মধ্যযুগের সাহিত্য হলেও গায়েনদের মুখে মুখে এবং লিপিকরদের দ্বারা পরিবর্তনের ফলে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য কিছুটা পরিলক্ষিত হয়েছে। গোপীচন্দ্রের গানের ভাষার কথা বলতে গেলে আমরা দেখি সমগ্র কাব্যটির মধ্যে যে ভাষা এবং শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে তা উত্তরবঙ্গের তথা অবিভক্ত বাংলার উত্তরবঙ্গের লোকভাষারই নিদর্শন। গোপীচন্দ্রের গানের ভাষার বিভিন্ন ধ্বনিগত বা শব্দ-উচ্চারণগতভাবে যে সকল বৈশিষ্ট্য গুলো পরিলক্ষিত হয় তাতে দেখা যায় এর ভাষা সম্পূর্ণই উত্তরবঙ্গের ভাষা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জাতি জনজাতির ভাষার ধ্বনি বা উচ্চারণগত এবং রূপগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, শব্দব্যবহার আমরা গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে খুঁজে পাই। এর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য গুলি সম্পর্কে নিম্নে সূত্রাকারে আলোচনা করা হল।

কাব্যে স্বামীকে 'সোয়ামি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙে উচ্চারিত হয়েছে। উচ্চারণের এরূপ ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা উত্তরবঙ্গীয় ধারার। যা গোপীচন্দ্রের গানে রয়েছে। যেমন কাব্যের এক জায়গায় আমরা পাই-

"একটা আমের পল্লব হস্তে করিয়া।
সোয়ামী, সোয়ামী' বলিয়া চলিল কান্দিয়া।।"[১৩]

শুনলু, বুঝলু, মারিনু প্রভৃতি ভাষা ও শব্দের প্রয়োগ উত্তরবঙ্গের, বিশেষত কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত। যার পরিচয় গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে বিস্তর লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

"আপন হাতে মারিনু মাক তৈলত ফেলিয়া'।
আমার লাকান পাপী নাই রাজ্য ভরিয়া।।"[১৪]

এছাড়াও অপর একটি জায়গায় পাই-

'একেনা নারীর কথা শুনলু মায়ের ঠাঞি।"[১৫]

গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে 'বাই' সম্বোধন আমরা পাচ্ছি। 'বাই' শব্দের অর্থ দিদি বা বোন। যেমন-

"রাজা বলে, শুন, ময়না, ময়নামতী 'বাই'[১৬]

এই 'বাই' সম্বোধন এখনো উত্তরবঙ্গে প্রচলিত আছে। সুতরাং উত্তরবঙ্গের ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে গোপীচন্দ্রের গানের গভীর নৈকট্য খুঁজে পাওয়া যায়।

কর্মকারকে 'ক' বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যা উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় বিশেষভাবে প্রচলিত। যেমন -

"যম বলে শুনেক ময়না হামি বলি তোরে"।[১৭]
"ধিয়ানত বসিয়া ময়না যমক দেখিল।"[১৮]

শব্দস্থিত 'অ' এর স্থলে 'র' এবং 'র' এর স্থলে 'অ' বা 'আ' এর ব্যবহার উত্তরবঙ্গের ভাষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট। গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে যার পরিচয় রয়েছে। যেমন -

'রন্ন খায় ধর্ম্মিরাজ পত্রে বসিয়া'[১৯]
'রদুনা পদুনা রাণীক ঘরকে দেখি বটবৃক্ষের ছায়া।
ছাড়ি যাইতে রঙ্গের জরুকে মোর বড় নাগে দয়া।'[২০]
'আইয়ত প্রজাক দেখি রাজা কান্দিতে লাগিল।'[২১]

শব্দস্থিত 'এ' (e) 'অ্যা' (a) রূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায় যেমন-

"এক্কে ন্যাদে ময়নার ধন ন্যাদেয়ে ফেলিল"।[২২]

এছাড়াও দ্যাও, ন্যাও, ক্যান, ব্যারায়, চ্যাঙরা, ঠ্যাঙ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ গানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যা একান্তই উত্তর বঙ্গের ভাষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

'কচু বাড়ি দিয়া বুড়া শিব যায় পলাইয়া।
কোলা ব্যাঙ্গের মতন ময়না নিগায় ন্যাদিয়া।'[২৩]

গোপীচন্দ্রের গানের ভাষার মধ্যে ল>ন রূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায় যা উত্তরবঙ্গের ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট।

"চল চল যাই দাদা পরামানিকের নাগিয়া।
কি বুদ্ধি দ্যায় পরামানিক আমাকে নাগিয়া।।"[২৪]
"হেমাই পাত্র বলি ময়না ডাকিবার নাগিল।"[২৫]

উত্তরবঙ্গের ভাষা তথা বিভিন্ন আঞ্চলিক ও কথ্যভাষার শব্দের প্রয়োগও গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যেমন বালি > বালু, স্নান > ছিনায়, চাঁদ > চান ইত্যাদি।

'চাউলের পিণ্ড না পাইয়া ময়না বালুর পিণ্ড দিল।'[২৬]

এছাড়াও

'পঞ্চলোটা গঙ্গার জলে স্বামীকে ছিনায়'[২৭]

'গোপীচন্দ্রের গানে'র মধ্যে একজায়গায় গোপীচন্দ্রকে বলতে শোনা যায়-

'মাএর কান্দন ওলা ঝোলা বোনের কান্দন সার'
কোলার ত্রি তোর মিছায় কান্দে দেশের ব্যবহার।।'[২৮]

এই যে লৌকিক কথা যা আজকেও উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানে আছে। বিভিন্ন প্রকার প্রবাদের মধ্যেও আমরা দেখি, যেমন এক জায়গায় আমরা পাই-

'দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আরো মিঠা ননী
সবাতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী'[২৯]

এই যে প্রবাদ যা উত্তরবঙ্গের লোক ভাষায় বিশেষভাবে প্রচলিত। উত্তরবঙ্গের করতোয়া নদীকে আমরা গোপীচন্দ্রের গানে পাচ্ছি, এছাড়াও রয়েছে জল্পেশ্বরের প্রসঙ্গ।

'উত্তরদিকে দরবার বৈসে রাজা জল্পেশ্বর।'[৩০]

সর্বোপরি আমরা বলতে পারি উত্তরবঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি ও ভাষা যেভাবে গোপীচন্দ্রের গানে আছে তা আসলে সমাজ ইতিহাসের বিশেষ ধারা। এটি শুধুমাত্র এক মৌখিক সাহিত্য বা নাথ সাহিত্যই নয়, এটি আসলে উত্তরবঙ্গের ভাষা-সংস্কৃতির অন্যতম ধারা। এককথায় এটি উত্তরবঙ্গের ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতির একটি অসামান্য দলিল।

Reference:

১. ড. দাশ, নির্মল; উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ, সাহিত্য বিহার, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ২০২০, পৃ. ২৬
২. ড. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,পৃ. ১৪৬-১৪৭
৩. ড. ভট্টাচার্য. শ্রীআশুতোষ; গোপীচন্দ্রের গান, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৬১, পৃ. ৩
৪. তদেব, পৃ. ৫
৫. তদেব, পৃ. ৫১৩
৬. তদেব, পৃ. ১০৩-১০৪
৭. তদেব, পৃ. ৯
৮. তদেব, পৃ. ৩২

৯. তদেব, পৃ. ৩৫-৩৬
১০. তদেব, পৃ. ৩৭
১১. তদেব, পৃ. ৩৪-৩৫
১২. তদেব, পৃ. ৪০
১৩. তদেব, পৃ. ১৯
১৪. তদেব, পৃ. ৭৭
১৫. তদেব, পৃ. ৫৫
১৬. তদেব, পৃ. ১০
১৭. তদেব, পৃ. ৯
১৮. তদেব, পৃ. ৭
১৯. তদেব, ৭০
২০. চট্টোপাধ্যায়,তপনকুমার; গোপীচন্দ্রের গানঃ পাঠকের চোখে, প্রজ্ঞাবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৬
২১. তদেব পৃ. ৮০
২২. ডঃ ভট্টাচার্য. শ্রীআশুতোষ; গোপীচন্দ্রের গান. তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১, পৃ. ১২
২৩. তদেব পৃ. ১০৪
২৪. তদেব পৃ. ৩
২৫. তদেব পৃ. ২৫
২৬. তদেব পৃ. ৩৪
২৭. তদেব পৃ. ৫৮
২৮. তদেব পৃ. ৫৪
২৯. তদেব পৃ. ৭৮
৩০. তদেব পৃ. ৪১

Bibliography:

ডঃ ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ; গোপীচন্দ্রের গান. তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১
চট্টোপাধ্যায়,তপনকুমার; গোপীচন্দ্রের গানঃ পাঠকের চোখে, প্রজ্ঞাবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭
ড.বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।
চৌধুরী,কমল; উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০১১, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা ৭০০০৭৩
ড. করিম, মীর রেজাউল; শেরশাবাদীয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, কলকাতা পুস্তক বিপণি।
ড. দাশ, নির্মল; উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ, সাহিত্য বিহার, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ২০২০
সেন, সুকুমার; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স।
ভট্টাচার্য্য, শ্রীআশুতোষ; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, একটি সপ্তর্ষি প্রকাশন উদ্যোগ